গণহত্যার ছবি

নূরুল উলা

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গিয়েছিলাম। সেদিন খবরের কাগজে পড়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সমঝোতা আসন্ন। তাই সবাই একটু নিশ্চিন্ত ছিলাম। মাঝরাতে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

একটু বিরতির পরই শুরু হলো অবিরাম গোলাগুলি আর মর্টারের আওয়াজ। আমরা সবাই শোবার ঘর আর বাথরুমের মাঝামাঝি প্যাসেজে আশ্রয় নিলাম ছিটকে-আসা কোনো বুলেট থেকে রক্ষা পাবার আশায়। একটু পরে কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে কি হচ্ছে তার একটা আভাস নেবার চেষ্টা করলাম।

আমি তখন থাকতাম ফুলার রোডে পুরাতন এসেমব্লি হলের উল্টোদিকে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য তৈরী চারতলার ফ্ল্যাটে। আমার জানালা থেকে জগন্নাথ হল ছাত্রাবাস আর তার বিরাট মাঠ সরাসরি চোখে পড়ে। সে রাত ছিলো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কিন্তু তার মাঝেও বুঝলাম জগন্নাথ হল ছাত্রাবাস আর তার চারপাশের রাস্তাগুলো মিলিটারি ছেয়ে গেছে। কিছু পরে দেখলাম হলের কতকগুলো ঘরে আগুন ধরে গেল। সেই আলোয় আবার দেখলাম কিছুসংখ্যক সৈন্য টর্চ হাতে প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে। বেশিক্ষণ তাকাবার ভরসা পেলাম না। করিডোরে ফিরে এসে গোলাগুলির শব্দের মধ্যেই জেগে সারা রাত কাটিয়ে দিলাম।

ভোর হতেই আবার উঁকি মেরে দেখলাম--কোথাও কাউকে চোখে পড়ল না; কেবল রাস্তায় পড়ে আছে অনেক ইটের টুকরো আর মাঠের উপর বিছানো দুটো বড় বড় সাদা চাদর। কিছুটা আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে তেমন বেশি খুন-জখম হয়তো হয়নি।

ড. নূরুল উলা

শিক্ষাবিদ, প্রফেসর, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং, বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

কিন্তু এরপরই যে দৃশ্যটির অবতারণা হলো--কোনোদিন কল্পনা করিনি সে দৃশ্য আমাকে জীবনে কখনো দেখতে হবে; আর কামনা করি, এ-রকম ভয়াবহ ঘটনা যেন কাউকে কখনো স্বচক্ষে দেখতে না হয়।

তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। মাঠের পশ্চিমদিক অর্থাৎ যেদিকে জগন্নাথ হলের প্রধান ছাত্রাবাস, সেদিক থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হলো জনাবিশেক পাকিস্তানী সৈন্য, সঙ্গে দু'জন আহত ছাত্র। ছেলে দুটোকে সৈন্যরা বেশ যত্ন করেই কাঁধে ভর দিয়ে এনে চাদর দুটোর পাশে বসাল--মনে হলো হাসপাতালে নিয়ে যাবে। একটু পরই চাদর দুটো টেনে সরিয়ে ফেলল--দেখলাম চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল বেশ কয়েকটি মৃতদেহ।

আহত ছেলে দুটো বসেছিল পূর্ব দিকে মুখ করে, লাশগুলো তাদের পেছনে। দু'জন সৈন্য আরেকটু পূর্বে সরে গিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের দিকে উঁচিয়ে ধরল হাতের রাইফেল--কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখলাম ছেলে দুটো হাত বাড়িয়ে কাকুতি-মিনতি করছে। তার পরই চলল গুলি।

কোন সৈন্য দুটো কিংবা তিনটার বেশি গুলি খরচ করেনি। শেষের গুলিটা করলো শুয়ে-থাকা লাশের উপর মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্য। ওদের হাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল সেটা মাঝারি ধরনের আর তা থেকে যে গুলি বেরিয়েছে তার শব্দ তেমন প্রচন্ড নয়।

জীবনে এই প্রথম স্বচক্ষে মানুষ মারা দেখলাম, আর সেটাও আহত লোককে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে। মানসিক শক পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আগেই নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হলো--কারণ তখন রাস্তা দিয়ে সামরিক গাড়ী মাইকে কারফিউ-এর ঘোষণা প্রচার করতে করতে গেল আর সেই সঙ্গে জানিয়েও গেল কেউ যেন জানালা দিয়ে বাইরে না তাকায়। কিন্তু তাকানো বন্ধ করলাম না, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি জানালার কাচ বন্ধ রাখি আর ঘরে কোনো আলো জ্বালানো না থাকে তাহলে বাইরে থেকে কিছু দেখা যাবে না। কেবল আশা করছিলাম সবচাইতে খারাপ যা হবার তা হয়ে গেছে, আর কিছু ঘটবে না, আর কিছু দেখতে হবে না। তখনও জানতাম না এ কেবল আরম্ভ।

অল্পক্ষণ পরে, কিছু সৈন্য আরো কয়েকজন আহত লোক নিয়ে এলো, এবারও পশ্চিম দিকের ছাত্রাবাস থেকে। তাদের ঠিক আগের মতন অর্থাৎ লোকগুলোর কাছে নিয়ে এসে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরল। তারপর শুরু হলো গুলি, অনেকটা এলোপাতাড়ি। কেউ বসে ছিল, কেউ দাঁড়িয়ে, তাদের উপর সামনে, বেশ কাছাকাছি থেকে গুলি চালাচ্ছে। আর পেছন থেকে উঠছে ধূলি। বুঝলাম কিছু গুলি দেহ ভেদ করে মাটিতে ঠেকছে। মাঠের উপর পড়ে-থাকা লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকল।

পরবর্তীকালে বিদেশী টেলিভিশনের সাংবাদিকরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেই সময় আমার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, আর কি করে আমার মাথায় এই হত্যাকান্ডের ছবি তোলার চিন্তা এল। আসলে ছবি তোলার আইডিয়া আমার নয়। পর পর দু'বার এভাবে আহত আর নিরস্ত্র মানুষদের ঠান্ডা মাথায় খুন করা দেখে বুঝলাম আরো

খুন হবে, আজ একটা সামগ্রিক গণহত্যা হবে। তখন বোকার মত বলে উঠলাম--আমাদের হাতেও যদি অস্ত্র থাকত। তখন পাশ থেকে আমার চাচাতো ভাই নসীম বলে উঠলো--ভাইজান, ছবি তোলেন।

তখন মনে পড়লো আমার বাসায় ভিডিও ক্যামেরাসহ একটা ভিসিআর আছে। জাপানে তৈরী প্রাথমিক যুগের এই পোর্টেবল ভিসিআর ছিল বেশ ভারি আর আমার জানামতে দেশে প্রথম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যামেরা সেট করে একটা কালো কাগজ ফুটো করে ক্যামেরার লেন্সটা তার মাঝে গলিয়ে দিয়ে জানালার কাচের ওপর রাখলাম। ঠিক যেটুকু ক্যামেরার লেন্স, বাদবাকী পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকল আর জানালা সামান্য ফাঁক করে সরু মাইক্রোফোনটা একটু বের করে রাখলাম। ইতোমধ্যে আরো-দুটো ব্যাচকে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে। ছবির রেকর্ডিং-এ ধরা পড়েছে বাদবাকী তিনটি গণহত্যা। এর মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ ছিল শেষেরটি।

তখন বন্দী আনা শুরু হয়েছে মাঠের পূর্বদিক থেকে। যাদের নিয়ে আসা হচ্ছে তাদের পরনে লুংগী, গেঞ্জি অথবা খালি গা। বুঝলাম সব ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়েছে। আগের লাশগুলোর কাছে নিয়ে এসে ওদের উপর গুলি করা হচ্ছে।

এরপর মাঠ হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে মাঠে বেশ কিছু লাশ জমে উঠেছে। ভাবলাম এবার বুঝি এই হত্যাযজ্ঞের শেষ। কিন্তু না, একটু পরে দেখলাম প্রায় জনা-চল্লিশেক অস্ত্রধারী সৈন্য মাঠের উত্তরদিকে লাইন করে দাঁড়াল। এরা ছিল লম্বা আর ফরসা, মনে হল পাঞ্জাবী সৈন্য। এরা কিন্তু কখনই প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করেনি। যারা গুলি চালিয়েছিল তারা ছিল অপেক্ষাকৃত বেঁটে আর কালো। এবার এমনি ধরনের জনা-দশেক সৈন্য মাঠের পূর্বদিক থেকে আবির্ভূত হল, সঙ্গে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশজন মানুষ। ভাবলাম বোধ হয় লাশ সরাবার জন্য এনেছে।

কিন্তু মানুষগুলো পড়ে থাকা লাশগুলোর কাছে আসার সাথে সাথে ওদের সঙ্গের সৈন্যরা আবার একটু পূর্বদিকে সরে গিয়ে রাইফেল তাক করল। কিছুক্ষণের জন্য চারদিক স্তব্ধ। এর মধ্যে দেখলাম একজন লোক, মুখে তার দাড়ি, হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে। তার পরই শুরু হলো গুলি। গুলির পর গুলি বর্ষণ হচ্ছে আর মানুষগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে আর তাদের দেহ-ভেদ-করা গুলির আঘাতে মাঠ থেকে উঠছে ধূলা।

গুলি যখন থামলো দেখলাম একমাত্র দাড়িঅলা লোকটা তখনো বেঁচে আছে। মনে হলো ওর দিকে সরাসরি কেউ গুলি চালায়নি। লোকটা আবার হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইতে শুরু করল। একজন সৈন্য তার বুকে লাথি মেরে তাকে মাটিতে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা তবু হাঁটু গেড়ে রইল। তখন তার উপর চালালো গুলি। তার মৃতদেহ আর সবার সঙ্গে একাকার হয়ে গেল।

মাঠের উত্তরদিকে যে সৈন্যরা এতক্ষণ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা এখন সংঘবদ্ধভাবে চলে গেল। আর হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের কেউ কেউ পড়ে

থাকা দেহগুলোর চারপাশে ঘুরে ঘুরে মনোযোগের সঙ্গে দেখল আর মাঝে মাঝে শেষবারের মতো গুলি করল মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য।

কিছুক্ষণ পর সব সৈন্য চলে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ আর ফাঁকা, কেবল জগন্নাথ হলের মাঠের উপর পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। দেখলাম রাস্তার উপর দিয়ে একটা ভ্যান চলে গেল, তার উপরে একটা গোল এন্টেনা ঘুরছে। বুঝলাম মাইক্রোওয়েভ ডিটেক্টর, কেউ কোনো কিছু ব্রডকাস্ট করছে কিনা ধরবার জন্য। আমি জানি আমার ভিডিও ক্যামেরা থেকে সামান্য কিছু তরঙ্গ ছড়াতে পারে, তাই তাড়াতড়ি সেটা অফ করলাম। ভিডিও টেপ রিওয়াইন্ড করে চেক করে যখন দেখলাম সব ছবি ঠিকমত উঠেছে তখন সেটা খুলে ভিতর থেকে যন্ত্রাংশ সরিয়ে নিয়ে সেটাকে সাময়িকভাবে অকেজো করে দিলাম। বেলা তখন দশটার বেশি হবে না। যেকোনো সময় আমাদের উপর হামলা হতে পারে আশঙ্কায় ওখানে বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন মনে করলাম না। কারফিউ সত্ত্বেও আমরা আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার নিয়ে পালিয়ে এলাম পুরনো ঢাকায়। আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ বেলা একটার দিকে একটা প্রকাণ্ড বুলডজার দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছি। কিন্তু তারপর সেখানে কি হয়েছে বলতে পারব না। অনুমান করি, লাশগুলো পুঁতে ফেলার উদ্দেশ্যেই মাটি খোঁড়া হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পরে জেনেছি, আমার অনুমান ছিলো সত্যি।